১৩ পাতার পর

শঙ্খ ঘোষ ঃ প্রতিষ্ঠান, আত্মপ্রতিষ্ঠান ও বিরোধিতা

সঙ্ঘ তবু পাবে না সত্যকে' (সত্য, আদিম লতাগুল্মময়)। অর্থাৎ 'প্রতিষ্ঠান মিথ্যাচারী'। প্রতিষ্ঠান ষড়যন্ত্রময় অবস্থান মেনে নেয় এবং অন্যকে দিয়েও তা মানিয়ে নেওয়াতে চায়। শঙ্খ বলেছেন, 'এই মিথ্যার প্রতাপ এতটাই যে সাধারণ মানুষকে সে ভুলিয়ে দিতে পারে জীবনের মানে।'[৮] সেই কারণেই কবিকে চিনে নিতে হয় সত্যিকারের প্রতিষ্ঠান কী। সে কি শুধুই রাজনৈতিক দল, পত্রিকাগোষ্ঠী? শিক্ষায়তন? শঙ্খের ভাষায় 'অন্নবিস্তর এরা সবাই।' কিন্তু লেখকের পক্ষে মূল প্রতিষ্ঠান হল 'সমসাময়িক জনরুচি।' চলমান জনতার যা চাহিদা, তার বিপ্রতীপে দাঁড়িয়ে একজন কবিকে লড়ে যেতে হবে। সময়, ধৈর্য এবং উপেক্ষা সহ্য করার বিক্রম দেখাতে হবে। শঙ্খ বলেছেন, 'কবিতার জগতে কেউ যদি প্রতিষ্ঠানকে ভাঙতে চান তবে তাঁরও প্রয়োজন কেবল নিঃশব্দে সেইসব কবিতা লিখে যাওয়া, যা সামাজিকদের পক্ষে অনায়াসে ব্যবহার্য বা আস্বাদ্য নয়, যা গোপন পদসঞ্চারে ঘিরে ফেলবে সবাইকে। প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে স্বতন্ত্র বিশ্বে জানানোর ততটা দরকার হয় না তখন, রচনাটি নিজে নিজে তখন হয়ে দাঁড়ায় প্রতিষ্ঠানবিরোধী।'[৯]

চার

তবু শেষ পর্যন্ত কিছু প্রশ্ন উঠবে। এবং উঠছেও। যিনি আজীবন 'ব্যক্তিগত দৃঢ়তা'য় বিশ্বাসী, বারবার বলছেন আত্মপ্রতিষ্ঠান ভাঙার কথা, তিনিই আজ নিজের অজান্তে প্রতিষ্ঠান হয়ে ওঠেননি তো? প্রশ্ন তুলছেন কেউ কেউ। প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিকও। কেননা, তাঁকে কেন্দ্র করে শ্রদ্ধার যে দুর্নিবার ঘটা, ভক্তির যে গদগদ প্রকাশ, অনুগতদের বৃত্ত, রক্ত-মাংসের মানুষকে ঈশ্বর বানিয়ে তোলার ব্যাকুলতা, এসবই খুব ভয়ের। ভয় এই কারণেই যে, শঙ্খ নিজেই একসময় এনিয়ে প্রশ্ন ছুঁড়ে দিয়েছিলেন পূর্বসূরিদের দিকে। বলেছিলেন — 'প্রতিষ্ঠানে থাকাটা ভয়ের নয়, প্রতিষ্ঠান হয়ে ওঠাই ভয়ের। একদিন যাঁরা প্রতিষ্ঠান ভাঙার কথা বলেছিলেন বাংলা কবিতায়, আজ কি তাঁরা এগিয়ে আসবেন আত্মপ্রতিষ্ঠান ভাঙবারও আয়োজনে?'[১০]

স্বাভাবিক কারণেই তাই প্রশ্ন উঠছে। কবি শরৎকুমার মুখোপাধ্যায় প্রশ্ন তুলেছিলেন 'আপনি শুনেছি কোনও কমিটিতে নেই কিন্তু কমিটির লোকেরা আপনার কাছে পরামর্শ চাইতে আসে। তার মানে, এক ধরণের নির্বাচনের মধ্যে প্রতিষ্ঠান আপনাকে জড়িয়ে রেখেছে। সেখানে সব কাজ কি ঠিকমতো হয়? না হলে, কীভাবে প্রতিবাদ করছেন আপনি?'[১১]

কবি অমিতাভ দাশগুপ্ত একইভাবে একসময় সমালোচনায় বিদ্ধ করেছিলেন শঙ্খকে। বলেছিলেন, 'কবিতা-অতিরিক্ত অসংখ্য কাজে আপনাকে বেশ কিছুকাল গড়ফাদারের ভূমিকায় দেখা যাচ্ছে। দিনের পর দিন কীসে-না-কীসে প্রায় পরিণামহীনভাবে জড়িয়ে যাচ্ছেন আপনি।... বেঁচে থাকতে থাকতেই ধ্রুবতারার ফ্রেমে বাঁধানো ছবি হয়ে যাবেন না, প্লিজ।'[১২]

৮ জানুয়ারি ২০১২। 'প্রতিদিন' পত্রিকা প্রকাশিত একটি পুস্তিকার 'গোঁসাইবাগান' শীর্ষক লেখায় শঙ্খকে শ্রদ্ধার মোড়কে কার্যত তুলোধনা করলেন কবি জয় গোস্বামী। সবে শঙ্খের 'হাসিখুশি মুখে সর্বনাশ' বইটি বেরিয়েছে। পড়ার পর জয়ের মনে হয়েছে, আলাদা আলাদাভাবে এই বইয়ের প্রতিটি কবিতা নিখুঁত হলেও তারা সবাই শঙ্খের আগের নানা লেখার ধরনকেই মনে করায়। অর্থাৎ পুনরাবৃত্তি দোষে দুষ্ট। পরিবর্তমান অবয়ব নেই সেসব কবিতায়। জয় লেখেন– 'যদিও এটা আশ্চর্য নয় যে, এই বইটি সম্পর্কেই নিকট-ভবিষ্যতে বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় সপ্রশংস নানা আলোচনা ছাপা হবে। কোনও কবি নিজে প্রতিষ্ঠান হয়ে উঠলে-- এটিই তাঁর দুর্ভাগ্য নিয়তি।'[১৩]

একই লেখায় তিনি শঙ্খের উদ্দেশ্যে বললেন—"এখন তিনি সমাজের অবশ্যমান্য ব্যক্তি। উচ্চতি বয়সের কবিদল এঁকেই সামনে রাখেন লক্ষ্য হিসেবে, অভ্যেস হিসেবে। এবং অনেক বছর ধরেই রাখেন। 'কৃত্তিবাস'-এর কবিদের সম্পর্কে, '৭১ সালে শঙ্খ ঘোষ লিখেছিলেন ঃ 'আজ তাঁরাই হয়ে উঠেছেন নতুন প্রতিষ্ঠান।' আবারও এই কথাটা একটু পাল্টে বলতে চাই, আজ শঙ্খ ঘোষ হয়ে উঠেছেন নিজেই এক প্রতিষ্ঠান।"[১৪]

পাঁচ

একথা সত্যি যে, '৭১ সালের শঙ্খের সঙ্গে ২০১৫-এর শঙ্খের তফাত অনেক। নতুন দশকে বহু ঘাত-প্রতিঘাতের পর শঙ্খ ঘোষ আর তাঁর কবিতাকে কেন্দ্র করে তৈরি হয়েছে নতুন গণউন্মাদনা। রাজনৈতিক পটপরিবর্তন ঘটে গিয়েছে গোটা দেশজুড়ে। এমনকী এরাজ্যেও পালাবদল ঘটেছে। প্রাতিষ্ঠানিক পুরস্কার ফিরিয়ে দিতে দেখেছি শঙ্খকে। দেখেছি নতুন করে পথে নামতেও। আত্মপ্রতিষ্ঠান ভাঙার কথা বলে বাইরের প্রচলিত প্রতিষ্ঠানকে এতখানি গুরুত্ব দান, তার বিরোধিতা, এসব কিছুকেই তাই কেউ কেউ একটু সন্দেহের চোখে দেখতে চান। বাজিয়ে দেখে নিতে চান তাঁর বলা কথাগুলোকে, যখন তিনি কোনও সাক্ষাৎকারে বলেন---'যেভাবে আমি লিখি, যেভাবে আমি বাঁচি, তার কোনোই অনুসৃতি নেই কোথাও, কোনও প্রভাব নেই। না-থাকাটাকে ভালোই মনে হয় আমার। সংস্কৃতিক্ষেত্রে কিছু ঘটিয়ে তুলবারও বিশেষ কোনো ক্ষমতা নেই আমার। অল্পসল্প ক্ষমতা যে জন্মাতে পারে না তা নয়, কিন্তু সেরকম কোনো সম্ভাবনার ক্ষীণ উপক্রম দেখলেই নিজেকে সরিয়ে নিয়েছি দূরে। কেননা, মাথার মধ্যে ক্ষমতা ঢুকে যাওয়াটাকে আমি ভয় পাই, অপছন্দ করি।'[১৫]

২০০৯-এর জুলাইয়ে 'বইয়ের দেশ' পত্রিকার একটি সাক্ষাৎকারে শঙ্খ বলেছিলেন---''আমি যে আড়ালের কথা বলি সে কোনো মিনারবাসিতার অন্তরাল নয়। ভিড়ের মধ্যে মিশে থাকতে, তার থেকে শ্বাস নিতে আমি ভালোবাসি। ভিড়ের মধ্যে থেকেও মনকে একা রাখা যায়, যদি কেউ চায়। 'সংঘে আমি একলা থাকিবটে/ একার পথে সংঘ টের পাই'। আর নানাজনের ভুল বোঝা? সে তো থাকেই জীবনে। তার হাত থেকে কেই-বা কবে পরিত্রাণ পায়।"[১৬]

যাঁরা শঙ্খের 'প্রতিষ্ঠান' কিংবা 'গড়ফাদার' হয়ে ওঠাকে, 'অবশ্যমান্যতা'কে এবং 'উচ্চতি বয়সের কবিদলে'র কাছে অভ্যাসের বস্তু হয়ে ওঠাকে সমালোচনার যোগ্য বলে বিবেচনা করেছেন, উপরের কথাগুলি অবশ্যই তাঁদের কাছে একটা জবাব হতে পারে। কেননা এই কথাগুলোর মধ্যেই লুকিয়ে আছে শঙ্খের গভীর জীবনবোধ। প্রকারান্তরে প্রতিষ্ঠান আর প্রতিষ্ঠানবিরোধিতার স্বতন্ত্র দর্শনটি। আসলে প্রতিষ্ঠানের বিরোধিতা করতে গিয়ে বিকল্প প্রতিষ্ঠান হয়ে ওঠার সম্ভাবনা সবসময়ই থেকে যায়। কিন্তু সেই বিকল্পতাকেও চূর্ণ করার কৌশল জানা এবং তার যথার্থ প্রয়োগই প্রকৃত প্রতিষ্ঠানবিরোধিতা। আর শঙ্খ সেখানে সসম্মানে উত্তীর্ণ বলেই আমার মনে হয়। কারণ তিনি আড়ালে নয়, ভিড়ের মধ্যে মিশেই 'একলা মন'টিকে সুরক্ষিত রাখতে চেয়েছেন জীবনভর। এবং সেই মন অবশ্যই মুক্ত এবং প্রতিষ্ঠানবিরোধী। সম্পূর্ণ বিপরীতমেরুর কবিতাদর্শনে বিশ্বাসী শৈলেশ্বর ঘোষ এ বিষয়ে সচেতন। প্রতিষ্ঠানের চরিত্রের ক্ষতিকর প্রভাব কতটা তা তাঁর অজানা নয়।... এই প্রতিষ্ঠানের মধ্যে নিজের সত্তাকে টিকিয়ে রাখার জন্য কবিকেও মুখের উপর একটা আবরণ দিয়ে নিতে হয়। শঙ্খ ঘোষেরও এরকম একটা আবরণ আছে। যে আবরণ সমাজ-প্রতিষ্ঠানের কাছে বিপজ্জনক মনে হয় না। প্রতিষ্ঠান তাঁকে পুরস্কৃত করে। তাঁর শব্দব্যবহারের নির্মলতাই তাঁর ছদ্মবেশ। তাঁর মুখশ্রীর আপাত অক্ষত কোষগুলি দেখে প্রতিষ্ঠান তাঁকে তাঁদের মূল্যমানে সুস্থ বলে ঘোষণা করে এবং কর্কটদুষ্টদের সামনে ঘোষণা করে শঙ্খ ঘোষের কোনও অসুখ নাই। কিন্তু আমরা জানি শঙ্খ ঘোষের অসুখ আছে এবং সে অসুখ সারবে না।'

সূত্র নির্দেশ

১। শঙ্খ ঘোষ, শব্দ আর সত্য, জানুয়ারি ২০০২, গদ্যসংগ্রহ-৩, দেজ, পৃষ্ঠা-১৪১।
২। তদেব, পৃষ্ঠা-১৪৮।
৩। সমীর রায়চৌধুরি, আমরা ক্ষুধার্ত, রবি পুস্তিকা, দৈনিক ৩৬৫ দিন, ৯ ডিসেম্বর, ২০১২।
৪। শঙ্খ ঘোষ, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১৪৮।
৫। তদেব, পৃষ্ঠা-১৪১।
৬। তদেব, পৃষ্ঠা-১৪৮-১৪৯।
৭। শঙ্খ ঘোষ, জানুয়ারি ২০১১, কথার পিঠে কথা (সাক্ষাৎকার সংকলন), পৃষ্ঠা-২০৭।
৮। তদেব, পৃষ্ঠা-২১।
৯। শঙ্খ ঘোষ, শব্দ আর সত্য, জানুয়ারি ২০০২, গদ্যসংগ্রহ-৩, দেজ, পৃষ্ঠা-১৪৯।
১০। তদেব, পৃষ্ঠা-১৪৪।
১১। শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়, জানুয়ারি-২০০০, শিক্ষক গবেষক কবি এবং গৌতম ঘোষদোস্তিদার (সম্পা), বিষয় শঙ্খ ঘোষ, পৃষ্ঠা-১৭।
১২। অমিতাভ দাশগুপ্ত, জানুয়ারি-২০০০, থাক জ্বরের মতো, প্রেমে, গৌতম ঘোষদোস্তিদার (সম্পা), বিষয় শঙ্খ ঘোষ, পৃষ্ঠা-২৯।
১৩। জয় গোস্বামী, ৮ জানুয়ারি-২০১২, গোঁসাইবাগান, ঋতুপর্ণ ঘোষ (সাপ্তাহিকী সম্পাদক), রোববার, দৈনিক প্রতিদিন, পৃষ্ঠা-৪৪।
১৪। তদেব, পৃষ্ঠা-৪৪।
১৫। কথার পিঠে কথা, প্রাগুক্ত, দিশা পত্রিকা, পৃষ্ঠা-৫১।
১৬। তদেব, পৃষ্ঠা-৬৩।
১৭। শৈলেশ্বর ঘোষ, ডিসেম্বর ২০১৩, উৎক্ষিপ্ত জেব্রা ও রাত-জাগা পাখি, সন্তোষ মুখোপাধ্যায় (সম্পা), নিঃশব্দের শিখা শঙ্খ ঘোষ, অনুষ্টুপ, দ্বিতীয় সংস্করণ, ডিসেম্বর ২০১৩, পৃষ্ঠা-৬৫।

গ্রন্থঋণ

১। শঙ্খ ঘোষের কবিতাসংগ্রহ (১-৩), দেজ।
২। শঙ্খ ঘোষের গদ্যসংগ্রহ (১-৮), দেজ।
৩। কথার পিঠে কথা (সাক্ষাৎকার সংকলন), জানুয়ারি-২০১১, দেজ।
৪। তারাপদ আচার্য, ডিসেম্বর-২০০৫, 'আমি কি নিত্য আমারও সমান', প্যাপিরাস।
৫। সুজিৎ ঘোষ, জানুয়ারি-২০১৫, শব্দের শিল্পী শঙ্খ ঘোষ, প্রতিভাস।
৬। শান্তি সিংহ (সম্পা), ডিসেম্বর-২০১৩, শঙ্খ ঘোষ, দিয়া পাবলিকেশন।
৭। শাওন নন্দী, মে-২০১২, পঞ্চাশ কবিতার নয়াঘর, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ।
৮। অচিন্ত্য মাজি, নভেম্বর-২০১১, সাম্প্রতিক কবিতার চালচিত্র, আশাবরী।
৯। অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত ও দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পা), জানুয়ারি-২০১১, আধুনিক কবিতার ইতিহাস, দেজ।

অসুরনিধনের অন্তর্কথা

ড. বাণীপ্রসাদ সেন

আকাশের বুকে নিত্য নিয়মিত উদ্ভাসিত হয়ে চলেছে আলো-ছায়ার সেই চিরন্তন চিত্র। শিউলি-অতসীর অপরূপ ফুল সম্ভারে। মাঠে-ঘাটে, প্রান্তরে উচ্ছ্বসিত কাশফুলের শ্বেতশুভ্র প্রকাশে দেবীপূজার প্রারম্ভিক আয়োজন। এমন সময়েই তো চিন্তনে-মননে, ধ্যানে-ধারণায় আন্দোলিত হয় দেবীতত্ত্বের প্রসঙ্গ। যথার্থ বোধ তৈরি না হলে যথাস্থানে আমাদের পূজা পৌঁছবে কিভাবে? ভালবাসার বস্তুটিকে আগে ভালভাবে জানতে হবে। সুতরাং তত্ত্বের মাধ্যমেই তদ্‌গত হওয়া যায়। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, "না জানলে ভক্তি করবি কাকে?" মধুসূদন সরস্বতী থেকে শ্রীমৎ অনির্বাণ সকলেই সেই একই কথা বলেছেন। ভারতীয় মহাজাতির জীবনে শক্তিসাধনার ঐতিহ্য সুদীর্ঘকাল পরিব্যাপ্ত। এই ঐতিহ্যই যেন এক অনির্বচনীয় ঐশ্বরিক সম্পদ যা আমাদের অনুক্ষণ অনুপ্রাণিত করে অশুভ ও অমঙ্গলকারক সকল প্রকার অসুরের বিরুদ্ধে সংহত চিত্তে সংগ্রাম করতে। এখানেই আমাদের চিন্তন-মনন এবং পূজা-অর্চনায় শক্তির মাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠিত ও গৃহীত হয়েছে।

বৈদিক চিন্তাধারার মননভূমিতে মিলেমিশে একাকার হয়েছে লৌকিক পুরাণ ও তান্ত্রিক সাধনা। এর মধ্যে আবার মনে রাখতে হবে আর্যদের মত অনার্যদেরও রীতিমত শক্তি– cult ছিল। শ্রী অনির্বান সুন্দরভাবে বলেছেন, সবাই যাত্রা শুরু করে পৌঁছেছেন সেই একে। অদ্বিতীয়ম্ ব্রহ্ম। এই পরম-ব্রহ্মেরই শক্তি হলেন মহামায়া আদ্যাশক্তি মা শ্রীদুর্গা। স্কন্দপুরাণের অংশ কাশীখণ্ডে আছে দুর্গমঃ, যং হন্ত্যা চণ্ডিকায়া দুর্গেতু নাম অভূৎ অর্থাৎ অসুরটির নাম দুর্গম যাকে বধ করে ব্রহ্মকৈবর্ত পুরাণেও বলা হয়েছে সা দুর্গা মেনকাকন্যা দৈন্যদুর্গতিনাশিনী। তিনি সকল দৈন্যদশা এবং যাবতীয় দুর্গতির বিনাশ করেন।

শ্রীদুর্গার রূপচরিত্রের যুগে যুগে যেভাবে বিবর্তন ঘটেছে তা যদি আমরা আলোচনা করি তাতে দেখা যায় শ্রীশ্রীচণ্ডী গ্রন্থটি পুরাণের অঙ্গ হলেও তন্ত্রশাস্ত্র হিসাবে স্বীকৃত। এই গ্রন্থের রচনাকাল প্রসঙ্গে স্বামী দুর্গাদীশ্বরানন্দ বলেছেন, খ্রিষ্টীয় প্রথম শতকে এটি রচিত হয়েছিল। অন্যদিকে পাশ্চাত্য পণ্ডিত পাজিটার (Pagiter) খ্রিষ্টীয় তৃতীয় শতককে শ্রীশ্রীচণ্ডীর সৃষ্টিকাল বলে উল্লেখ করেছেন। বঙ্গভূমিই আবার শক্তিসাধনার পীঠস্থান। অনেক সাধক বিশেষজ্ঞের অভিমত অনুসারে বঙ্গদেশ বিশেষভাবে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলেই চণ্ডীগ্রন্থের রচনা হয়েছিল। পার্বত্য চট্টগ্রামে শবর ও কিরাতের ন্যায় অনেক আদিম জনগোষ্ঠী আছে যাদের উপাস্য দেবী হলেন শ্রীদুর্গা।

শ্রীদেবীভাগবতম্ গ্রন্থের ত্রয়োদশ অধ্যায়ে দেবীর স্তুতি গেয়ে বলা হয়েছে হে দেবী শিবে, আপনি বৃত্রাসুর, চণ্ডমুণ্ড, ধূম্রলোচন, রক্তবীজ, শুম্ভ, নিশুম্ভ ও আরো অনেক দানবদের বিনাশ করে আমাদের মঙ্গলসাধন করেছেন। আপনাকে নমস্কার করি। এই সব বিভিন্ন অসুরের নিধনপর্ব চর্চা করলে অপরূপ বৈচিত্রের সন্ধান পাওয়া যায়। উল্লেখ্য, দেবী দুর্গা নিজে প্রত্যক্ষভাবে একমাত্র অসুর মহিষাসুরকে এক ভয়ঙ্কর যুদ্ধের মাধ্যমে বধ করেছিলেন। অন্যান্য অসুরকে বধ করার জন্য আদ্যাশক্তি ব্রহ্মময়ী অন্য দেবী ও দেবতাদের দায়িত্ব দিলেও সকল কাজের মূলে তিনিই যে আছেন, তার কথা দেবী নিজেই বিভিন্নভাবে ব্যক্ত করেছেন আত্মপরিচয় প্রদানের সূত্রে। অসুর শুম্ভ যখন অভিযোগ করেছিল তুমি অন্য দেবদেবীর শক্তি সংগ্রহ করে অসুর নিধনে নিযুক্ত হয়েছ। তোমার অহংকার করা উচিৎ নয়। বিশ্বমাতা মহাশক্তি মা দৃপ্ত কণ্ঠে উত্তর দিলেন, একৈবাহং দুগতত্র দ্বিতীয়া কা মমাপরা অর্থাৎ সংসারে তিনি একাই আছেন, আর দ্বিতীয় কেউ নেই। অন্য সকল দেবদেবী তারই বিভূতিমাত্র অর্থাৎ তারই অংশ। দেবীমহাত্ম্যের বর্ণনায় দেখি যে ক্রোধে অগ্নিবর্ণা দেবী অম্বিকার ললাটফলক থেকে নির্গত হলেন করালবদনী ভয়ঙ্করী কালী তিনিই চণ্ড ও মুণ্ড নামের দুই অসুরকে বধ করলেন। তাই মা হলেন চামুণ্ডা।

পুরাকালে যেমন অসুরদের প্রত্যেকের বাহিনী ছিল একালেও তেমনি অসুরদের অর্থাৎ রাষ্ট্রবিরোধী দেশদ্রোহী, সমাজবিরোধী, সন্ত্রাসবাদী ও বহুবিধ অপকর্মের মূল পাণ্ডা বা খলনায়ক (হিন্দি সিনেমার ভিলেনদের ন্যায়) গোত্রের লোকগুলির বাহিনী আছে। এদেশে রাজনীতি, অর্থনীতি সবই তো আজ 'অসুর নিয়ন্ত্রিত'। এদের ধারাবাহিক রাজত্ব দেখে মানুষ হয়ত হতাশ বোধ করে কিন্তু এদের পরিণতি যে নির্ধারিত তা তো দেখাই যায়।

অসু শব্দটির মূল অর্থ হল শরীরগত প্রাণ। এই অসুতে অর্থাৎ প্রাণেই যার সন্তোগসুখ তাকেই বলা হয় অসুর। যে শুধুমাত্র দেহগত ভোগে আসক্ত। নানা প্রকারের নেতিবাচক প্রবৃত্তির দ্বারা অসুরদের শনাক্ত করা যায়। অহঙ্কার, দম্ভ, দর্প, কাম, ক্রোধ, লালসা ইত্যাদি হল আসুরিক প্রবৃত্তি অর্থাৎ এই সবই হল দেবস্বভাবের বিপরীত। বলা বাহুল্য, এই সবই হল তমোরগের পরিচায়ক রূপ। আমরা অনেক সময় বলি, জীবন মানে সংগ্রাম। এখানে সেই সংগ্রাম যা নিরন্তর ঘটে চলেছে আমাদের অন্তরে-বাহিরে তাই হল দেবাসুরের সংগ্রাম। সৃষ্টির আদিকাল থেকেই এই সংগ্রামের সূচনা যা আজও অব্যাহত। বস্তুতপক্ষে দুর্গাপূজা বলতে মা দশভূজার মহিষাসুরমর্দিনীর মূর্তিটির প্রচলন ও প্রতিষ্ঠা সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয়। শ্রীশ্রীচণ্ডীতে আছে ''নিঃশেষ-দেবগণশক্তি-সমূহ-মূর্তি'' অর্থাৎ সমস্ত দেবতার সমষ্টিগত শক্তির ঘনীভূত রূপ। মায়ের এই রূপেই সমাহিত জ্ঞান, শ্রী, সিদ্ধি এবং তেজ। মা হলেন সর্বশক্তিময়ী। আমাদের পঞ্চভূতের শরীরে তিনি বিরাজমান। সকল প্রাণী, অপ্রাণীর মধ্যে তিনিই অবস্থান করছেন। শরীরে চৈতন্যশক্তি, বায়ুর মধ্যে স্পন্দনশক্তি, জলে প্রবত্বশক্তি, অনলে অর্থাৎ অগ্নিতে তেজঃশক্তি, আকাশে শূন্যশক্তি ও পাথরে জড়শক্তি। শক্তির অন্যান্য প্রধান প্রধান রূপগুলি হল আনন্দশক্তি, বীর্যশক্তি, সৃষ্টিশক্তি ইত্যাদি। আমরা অনেকেই হয়ত জানি না যে শ্রীশ্রীচণ্ডীতে আছে দেবী ক্রমান্বয়ে এগারোটি অসুর বধ করেন — মধু, কৈটভ (নারায়ণের মায়াতে), চিক্ষুর, চামর, মহিষাসুর, ধূম্রলোচন, চণ্ড, মুণ্ড, রক্তবীজ, শুম্ভ এবং নিশুম্ভ। এর মধ্যে মহিষাসুর বধের বিষয়টির বিশেষ গুরুত্ব আছে। দেবলোকের সমস্ত তেজ মা দুর্গার মধ্যে সমস্ত হয়েছিল। তাঁরা অস্ত্রশস্ত্রও দিলেন। মহাদেব দিলেন শূল, বিষ্ণু দিলেন সুদর্শন চক্র, বরুণ শঙ্খ, অগ্নি শক্তি, ইন্দ্র বজ্র, যম দণ্ড, ব্রহ্মা রুদ্রাক্ষ, মালা ও কমণ্ডলু, বিশ্বকর্মা কুঠার, বাসুকি নাগহার ইত্যাদি। অসুরনিধনের অন্তরালে যে সারকথাটি নিহিত আছে তা হল ঈশ্বর তো আমাদের মধ্যেই আছেন। আমাদেরই অসুর নিধনের জন্য সকল শক্তি, সাহস ও তেজের অধিকারী হতে হবে। সহস্র অসুরের নানাবিধ অপকর্মে, অত্যাচারে, অবিচারে সমাজ প্রতিক্ষণে বিশ্বস্ত ও বিপর্যস্ত হয়ে চলেছে। বিশ্বমাতা তার কর্মফলের বিচার করে চূড়ান্ত শাস্তি দেবেন। কিন্তু তাই বলে মানুষ নিশ্চুপ থাকবে তা শাস্ত্রসম্মত নয়। রাষ্ট্রের বিধি-বিধানের মধ্যে থেকেও আমরা আমাদের কর্তব্য পালন করব, এটাই হবে উপযুক্ত পন্থা।

সাহায্যের হাত

আশিসবরণ সামন্ত

সল্টলেক-বর্ধমান ননস্টপ বাসে বাসায় ফিরছিল সুগতা। পুরো নাম সুগতা সরকার। ডবল-সিটে জানালার ধারে বসেছিল সে। কোলে মাস পাঁচেকের শিশু। পাছে শিশুটিকে সকালের ঠাণ্ডা বাতাস লাগে তাই অনভিজ্ঞ মন নিয়ে জানালা বন্ধ করে একটি ছোটো খাটো কক্ষ বানিয়ে নিয়েছিল সে। জানালার কাচ ভেদ করে রাস্তার দুপাশে প্রকৃতির মিষ্টিরূপ ঠিকরে পড়ছিল তার বাইশটি বসন্ত পার করা চোখে। উদাসমনে আদর করছিল কোলে থাকা আত্মজটিকে। পাশের ডান সিটে বসে আপনমনে সদ্য হাতে পাওয়া এম. এ. ইংরেজির মার্কসিটটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছিল সৌমাল্য। চোখে চোখ পড়ে যেতেই সরু সুতোর মতো রেখা ফুটে ওঠে দুজনেরই ঠোঁটে। পরে সৌমাল্যর লক্ষ্য পড়ে যায় সুগতার ডান হাতটির দিকে। দেখে, কবজি থেকে আঙুল সহ হাতের বাকি অংশটি নেই। শিউরে ওঠে সৌমাল্য। কৌতূহলী মন আনচান করে। ভাবে, তাহলে কি কোনদিন দুষ্কৃতিদের লালসার শিকার হয়েছিল। কাজ হাসিল করে স্মৃতিচিহ্ন রেখে গেছে।

শিশুটি অনেকক্ষণ ধরেই মাকে জ্বালাচ্ছে। ফিডিং বোতল খুলে মুখে দিয়েও শান্তি নেই। আসলে অভ্যস্ত নয়। বাসে যাতায়াতের জন্যেই ফিডিং বোতল রাখতে হয়েছে। শিশুটি বারবার বুকের কাপড় সরিয়ে দিয়ে খাদ্য খুঁজছে। এক হাতে শিশুটিকে ধরে অনেকক্ষণ ধরে ব্লাউজটা সরিয়ে দেবার চেষ্টা করছিল সুগতা। পারছিল না। শিশুটি এবার অতিরিক্ত জ্বালাতন করতেই সৌমাল্যর দিকে তাকিয়ে বলে—

দাদা, প্লিজ একটি হেল্প করবেন?

সৌমাল্য বাঁদিকে ঘুরে তার হাত দুটি বাড়িয়ে দেয়।

কবিতা

আমার স্বপ্ন আমার ইচ্ছে

সুকোমল দাস

আমাকে সদ্য দুধ-আসা ধানের শিষের মতো করে দাও
আমি শুধু জন্ম-উদ্যুখ সোনালি ফসলের স্বপ্ন দেখি।
আমাকে আঁধারের জঠর থেকে মুক্তিকামী
প্রথম সূর্যকিরণ হতে দাও।
আমি শেষ রাতের শরীরে শুয়ে থাকা ভোরের স্বপ্ন দেখি
আমাকে ঈশ্বরপিপাসু আজানের প্রথম
অনুরণন বা সান্ধ্য আহ্নিকের প্রথম নমন হতে দাও,
আমি আত্মবিশ্বাসী ঈশ্বরের স্বপ্ন দেখি।
আমায় মাতৃস্তনে প্রথম দুগ্ধবিন্দু হতে দাও
আমি সদ্যজাত শিশুর দুধে ভেজানো ঠোঁটের স্বপ্ন দেখি
আমি শুধু বলে যাই—

সভ্যতা শুধু উদ্ভপ্ত সীমার বিনিময় নয়,
দেউলিয়া সময়ের মঞ্চে বিলয়নৃত্যরত
নটরাজও নয়
সভ্যতায় এখনও আছে সৃষ্টির প্রপদ
আর জীবনের আনন্দ ভৈরবী।